প্রত্যাশার পথরেখা

৪

কৃষি

একান্ত সাক্ষাৎকারে ব্রির মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান

ধান গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দূর করতে হবে

দেশের বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী **ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান** ২০২৪ সালের ২০ আগস্ট বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর আগে তিনি সফলতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘদিন ধরে ধানের নানামুখী গবেষণা ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এই বিজ্ঞানী কথা বলেছেন ধানের ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিকল্পনা এবং এই খাতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি **নিজামুল হক**

> অনেক কৃষক জানেন না নতুন প্রযুক্তি কিভাবে কাজ করবে, এর সুবিধা ও ঝুঁকি কী। এ ছাড়া প্রাথমিক খরচ, এক মৌসুমের ফসলের ওপর নির্ভরতা, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও মাঠে কারিগরি সহায়তার অভাব প্রযুক্তি গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। পাশের কৃষকের সফল ফলাফল না দেখলে অনীহা দেখা দেয়। তাই হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও মাঠভিত্তিক প্রদর্শনী জরুরি।
>
> মোবাইল অ্যাপ, কল সেন্টার ও এসএমএসের মাধ্যমে কৃষক তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। স্মার্ট যন্ত্রপাতি ও প্রিসিশন কৃষির মাধ্যমে খরচ কমছে ও উৎপাদন বাড়ছে। অনলাইন প্রশিক্ষণ ও অ্যাগ্রি-টেক স্টার্টআপের মাধ্যমে কৃষক-ক্রেতার সরাসরি সংযোগ হচ্ছে। গবেষণা ও নীতিগত সহায়তায় স্মার্ট জাত ও জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হচ্ছে

কালের কণ্ঠ : আমরা জানি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কৃষির ওপর পড়ছে। মোকাবেলায় ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে?

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : বাংলাদেশ বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে মাত্র ০.৪৭ শতাংশ অবদান রাখলেও Climate Risk Index-2021 অনুযায়ী চরম আবহাওয়াজনিত ক্ষতির দিক থেকে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জোয়ার-ভাটা ও খরা আরো তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। মোকাবেলায় ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট লক্ষ্যভিত্তিক গবেষণা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও অংশগ্রহণমূলক সম্প্রসারণ কৌশল প্রয়োগ করছে। বিগত এক দশকে লবণাক্ততা, জলমগ্নতা, খরা, জোয়ার-ভাটা ও ঠাণ্ডা সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। গুটি ইউরিয়া, মিনিপুকুর ও পানিসাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। জলবায়ু অর্থায়নের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলো হলো : জলবায়ু সহনশীল জাতের বিস্তার, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষক-যুবক-নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি, টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভ্যালু অ্যাডিশন, বাজার উন্নয়ন, ভর্তুকি ও পুনর্বাসন, আবহাওয়া সতর্কীকরণ ভিত্তিক কৃষি, তথ্যভাণ্ডার উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

কালের কণ্ঠ : কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন?

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ১২১টি আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে, এর মধ্যে ১১৩টি ইনব্রিড এবং আটটি হাইব্রিড। এসব জাতের মধ্যে রয়েছে প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, জিংকসমৃদ্ধ, লো-জিআই, উচ্চ প্রোটিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও গাবাসমৃদ্ধ ধান। দেশে ধান আবাদি জমির ৭৫ শতাংশের বেশি এলাকায় এই জাতের চাষ হচ্ছে। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা আধুনিকায়নের ফলে জাত উদ্ভাবনে জিনেটিক গেইন ১.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ ছাড়া ৩০০টির বেশি উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। Rice Vision 2050, Doubling Rice Productivity 2030 ও SDA বাস্তবায়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অর্গানিক সার উদ্ভাবনের মাধ্যমে সার ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব কৃষিতেও অবদান রাখা হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ : ধান গবেষণা এবং সম্প্রসারণের মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। কী কী সমন্বয়হীনতা রয়েছে, এই সমস্যা মোকাবেলায় আপনার পরামর্শ কী?

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : ধান গবেষণায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সঙ্গে পর্যাপ্ত সমন্বয় নেই। ফলে অনেক উদ্ভাবন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কৃষকের কাছে পৌঁছায় না। গবেষণার সঙ্গে সম্প্রসারণের সমন্বয় কৃষি খাতের উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

ব্রি নিয়মিতভাবে বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালার আয়োজন করে, যেখানে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ ও উপকরণ সরবরাহের সঙ্গে জড়িত সব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের সুপারিশমালার ভিত্তিতে পরবর্তী বছরের গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১৪টি অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে ব্রির বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে গবেষণা সম্প্রসারণ কর্মশালা আয়োজন করেন, যেখান থেকে সরাসরি মাঠ পর্যায়ের সমস্যাভিত্তিক সুপারিশমালা প্রণীত হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল নিয়মিতভাবে গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালার আয়োজন করে, যেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী বছরের গবেষণা পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

তার পরও কিছু সমন্বয়হীনতা থাকে। তা দূরীকরণের জন্য নিয়মিত যৌথ পরিকল্পনা ও পর্যালোচনাসভার আয়োজন করা প্রয়োজন, যাতে গবেষণা অগ্রাধিকার মাঠ পর্যায়ের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। গবেষক, সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষক অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে যৌথভাবে সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধান নির্ধারণ করা যায়।

যৌথ মাঠ পরীক্ষা ও প্রদর্শনী প্লট বাড়ানো উচিত, যাতে নতুন জাত ও প্রযুক্তির কার্যকারিতা সরাসরি কৃষকের কাছে তুলে ধরা যায়। সম্প্রসারণকর্মীদের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার কোর্স চালু করা প্রয়োজন, বিশেষ করে নতুন ধানের জাত ও জলবায়ু স্মার্ট প্রযুক্তি সম্পর্কে।

দ্বিমুখী ফিডব্যাক ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি, যাতে মাঠ পর্যায়ের সমস্যা দ্রুত গবেষকদের কাছে পৌঁছায় এবং গবেষণার ফল দ্রুত মাঠে প্রতিফলিত হয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণা তথ্য সহজ ভাষায় সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষকের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে।

কালের কণ্ঠ : আপনি কি মনে করেন, দেশের চাহিদা অনুযায়ী ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সব গবেষণা যথাসময়ে নিতে পারছে?

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : পুরোপুরি পারছে সেটি বলা যাবে না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পারছে। উচ্চফলনশীল ও জলবায়ু সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে ব্রি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তবে দেশের ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তনশীল চাহিদার তুলনায় সব গবেষণা যথাসময়ে ও পর্যাপ্ত মাত্রায় সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্রির গবেষণা দেশের চাহিদা পূরণে সফল হয়েছে; যেমন—উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে ধারাবাহিক সাফল্য, বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমের জন্য উপযোগী বহু জাত সময়োপযোগীভাবে অবমুক্ত হওয়া, জলবায়ু সহনশীল ধান (লবণাক্ততা, খরা, বন্যা সহনশীল) উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দ্রুত বাড়ছে, তাই নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গতি তুলনামূলকভাবে ধীর। অনেক এলাকার (যেমন—চরম লবণাক্ত উপকূল, খরাপ্রবণ বরেন্দ্র) জন্য বিশেষায়িত জাত এখনো পর্যাপ্ত নয়। পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ও বাজারবান্ধব ধানের জাত (যেমন—জিংক, আয়রনসমৃদ্ধ, প্রিমিয়াম চাল) গবেষণায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জাত অবমুক্ত হলেও বীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণে দেরি হওয়ায় কৃষক সময়মতো সুফল পান না। এ ছাড়া জনবল, অবকাঠামো ও বাজেট সীমিত থাকায় গবেষণার চ্যালেঞ্জ বেড়ে যাচ্ছে।

কালের কণ্ঠ : সম্প্রতি কোন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি বা ফসল উদ্ভাবন কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে?

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : নতুন ধানের জাত ও আধুনিক চাষ পদ্ধতি সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও অপুষ্টি মোকাবেলায় সক্ষম ধানের জাত অন্তর্ভুক্ত। কৃষকরা পানিসাশ্রয়ী সেচ, রোপণযন্ত্র, হারভেস্টার, উইডার, জৈব ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি ব্যবহার করে কম সময়ে বেশি ফলন পাচ্ছেন। মাটির ওপর নির্ভর সারের সঠিক ব্যবহার ও ডিজিটাল সম্প্রসারণ প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে।

কালের কণ্ঠ : প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকের প্রধান বাধা কী?

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : সবচেয়ে বড় বাধা হলো সচেতনতার ঘাটতি। অনেক কৃষক জানেন না নতুন প্রযুক্তি কিভাবে কাজ করবে, এর সুবিধা ও ঝুঁকি কী। এ ছাড়া প্রাথমিক খরচ, এক মৌসুমের ফসলের ওপর নির্ভরতা, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও মাঠে কারিগরি সহায়তার অভাব প্রযুক্তি গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। পাশের কৃষকের সফল ফলাফল না দেখলে অনীহা দেখা দেয়। তাই হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও মাঠভিত্তিক প্রদর্শনী জরুরি।

কালের কণ্ঠ : ডিজিটাল কৃষি ও স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচার কিভাবে বাস্তবে কাজ করছে?

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : মোবাইল অ্যাপ, কল সেন্টার ও এসএমএসের মাধ্যমে কৃষক তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। স্মার্ট যন্ত্রপাতি ও প্রিসিশন কৃষির মাধ্যমে খরচ কমছে এবং উৎপাদন বাড়ছে। অনলাইন প্রশিক্ষণ ও অ্যাগ্রি-টেক স্টার্টআপের মাধ্যমে কৃষক-ক্রেতার সরাসরি সংযোগ হচ্ছে। গবেষণা ও নীতিগত সহায়তায় স্মার্ট জাত ও জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ : ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কৃষকের জন্য কী ধরনের সমন্বিত সমাধান পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে?

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : উপকূলীয় এলাকায় লবণ সহনশীল ধান, ধান-মাছ ও ভাসমান চাষ, ডিজিটাল আবহাওয়া সতর্কতা; হাওর ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় আগাম ধান, যান্ত্রিক ফসল কর্তন, ফসল বীমা; খরা ও বরেন্দ্রে খরা সহনশীল ফসল, পানিসাশ্রয়ী সেচ; চর ও নদীভাঙনে স্বল্পমেয়াদি ও বন্যা সহনশীল ধান; পাহাড়ি এলাকায় ঢালু জমিতে চাষ ও স্থায়ী ফল বাগান; শহর এলাকায় নগর কৃষি ও আধুনিক যান্ত্রিকীকরণ।

কালের কণ্ঠ : ঋণ, সেচ, সার বা বীজ সমস্যার সমাধানে গবেষণার ভূমিকা কী?

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : ব্রি সরাসরি ঋণ বা সেচ সমস্যা সমাধান না করলেও টেকসই ও কম খরচে উৎপাদনযোগ্য প্রযুক্তি, ঝুঁকি সহনশীল জাত, পানি ও সারসাশ্রয়ী পদ্ধতি ও উন্নত বীজ প্রবর্তনের মাধ্যমে সমস্যার মূল কারণ কমাচ্ছে। ফলে উৎপাদন স্থিতিশীল ও ব্যয় কমে, যা কৃষকের ঋণ গ্রহণের ঝুঁকি কমায়।

কালের কণ্ঠ : বাজারজাতকরণ ও ফসলের মূল্য স্থিতিশীল করতে সরকারি উদ্যোগ কতটা কার্যকর?

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : সরকারি সহায়ক মূল্য ও সংগ্রহ কার্যক্রম সীমিত প্রভাব ফেলে। মূল কারণ হলো মধ্যস্বত্বভোগী আধিপত্য, সংরক্ষণ সুবিধার অভাব। সমাধানের জন্য প্রয়োজন ফসলভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি মূল্যনীতি, খামারগেটে সরকারি সংগ্রহ, কোল্ড স্টোরেজ ও প্রক্রিয়াজাত প্রণোদনা, ডিজিটাল বাজার তথ্য, কৃষক সংগঠন ও চুক্তিভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ।

কালের কণ্ঠ : স্থানীয় অফিস ও কেন্দ্রগুলোতে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো কী?

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও নতুন স্যাটেলাইট স্টেশনের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো, জনবলস্বল্পতা এবং আধুনিক অবকাঠামোর অভাব। হাই-থ্রুপুট ফেনোটাইপিং সুবিধা, ক্লাইমেট হাউস, ড্রোন ল্যাবরেটরি, জিনোম সেন্টারের প্রয়োজন রয়েছে। এ ছাড়া আধুনিক ল্যাব, হাইব্রিডাইজেশন ব্লক, রোগ নির্ণয় এবং মাটি পরীক্ষা করার সুবিধা প্রয়োজন। পদোন্নতির জটিলতার কারণে ব্রেইন ড্রেন ঘটছে, যা প্রতিরোধ করতে পদোন্নতি সহজীকরণ ও সুবিধা বৃদ্ধি করা জরুরি।

কালের কণ্ঠ : ভবিষ্যতের কৃষির ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্রির বড় পরিকল্পনা কী?

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : স্বল্প জীবনকাল, উচ্চফলনশীল ও খরা, লবণাক্ততা, বন্যা, ঠাণ্ডা ও তাপ সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন। পোকা-মাকড়, রোগ-বালাই ও আবহাওয়াজনিত প্রতিকূলতা সহনশীল ধান। জিংক, আয়রন, ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ধান। প্রতিযোগিতামূলক, সুগন্ধি ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত জাত উদ্ভাবন। পাহাড়ি, উপকূলীয়, বন্যাপ্রবণ ও চরাঞ্চলের জন্য বিশেষ ধান উন্নয়ন। গবেষণার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে—স্পিড ব্রিডিং সেন্টার, হাই-থ্রুপুট ফেনোটাইপিং এবং জিনোটাইপিং সুবিধা, রেইন আউট শেল্টার, ড্রোন ফেনোটাইপিং ল্যাবরেটরি, মলিকুলার ও বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরির আধুনিকায়ন করা হবে। প্রিসিশন অ্যাগ্রিকালচার এবং আইওটিভিত্তিক উদ্ভাবন যেমন—অটোমেটেড এডব্লিউডি প্রযুক্তি চালু করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। ■

সুপারিশ

- প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও মাঠভিত্তিক প্রদর্শনী জরুরি করতে হবে
- মধ্যস্বত্বভোগী আধিপত্য, সংরক্ষণ সুবিধার অভাবে ফসলভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি মূল্যনীতি, খামারগেটে সরকারি সংগ্রহ, কোল্ড স্টোরেজ ও প্রক্রিয়াজাত প্রণোদনা, ডিজিটাল বাজার তথ্য, কৃষক সংগঠন ও চুক্তিভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ করতে হবে
- জনবলস্বল্পতা এবং আধুনিক অবকাঠামোর অভাব দূর করতে হবে
- হাই-থ্রুপুট ফেনোটাইপিং সুবিধা, ক্লাইমেট হাউস, ড্রোন ল্যাবরেটরি, জিনোম সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে
- আধুনিক ল্যাব, হাইব্রিডাইজেশন ব্লক, রোগ নির্ণয় এবং মাটি পরীক্ষা করা সুবিধাজনক করতে হবে

মঙ্গলবার
ঢাকা, ১৩ মাঘ ১৪৩২
৭ শাবান ১৪৪৭ হিজরী
TUESDAY 27 JANUARY 2026
১২ পৃষ্ঠা, মূল্য : ১২ টাকা

দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

জামায়াতের রূপকল্প ও কৃষকদের নিয়ে কিছু কথা □ পৃষ্ঠা ৪
বাংলাদেশের সমর্থনে পাকিস্তানের তিন ভাবনা □ পৃষ্ঠা ৮
রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার যেন কথার ফুলঝুরি না হয় □ পৃষ্ঠা ১০

রেজি : ডিএ ৩৮৩ ৫২বর্ষ : ১১তম সংখ্যা www.dailysangram.com sangram.info Thedailysangram

তারিখঃ২৭/০১/২০২৬ (পৃষ্ঠাঃ০৬

চট্টগ্রামে এলএসটিডি প্রকল্পের উদ্যোগ

রাইস ট্রান্সপ্লান্টারে আধুনিক প্রযুক্তিতে ধান চাষে নতুন সম্ভাবনা

চট্টগ্রাম (হাটহাজারী) সংবাদদাতা : চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে আধুনিক কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ধান চাষে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান গবেষণাগার উন্নয়ন (এলএসটিডি) প্রকল্পের অর্থায়নে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) স্যাটেলাইট স্টেশন, চট্টগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

হাটহাজারী উপজেলার চারিয়া প্রযুক্তি গ্রামে কৃষি যন্ত্রপাতির প্রায়োগিক পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষকের জমিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক আপ্রু মারমা। তিনি বলেন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে কম বয়সী চারা রোপণ করায় সময়, শ্রম ও ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে সাশ্রয় হয়। একই সঙ্গে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যা কৃষকদের আর্থিকভাবে লাভবান করবে। তিনি আরও বলেন, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ধান চাষ সম্প্রসারণে ব্রি স্যাটেলাইট স্টেশন, চট্টগ্রাম নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাটহাজারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মেজবাহ উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক মোঃ ওমর ফারুক এবং ব্রি স্যাটেলাইট স্টেশন, চট্টগ্রামের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোছাঃ আমিনা খাতুনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা।

ব্রি স্যাটেলাইট স্টেশন, চট্টগ্রামের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোছাঃ আমিনা খাতুন বলেন, এলএসটিডি প্রকল্পের আওতায় চারিয়া গ্রামকে একটি প্রযুক্তি গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, প্রদর্শনী ও গবেষণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ধান চাষকে আরও উৎপাদনমুখী করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী কৃষক শাহ আলম বলেন, আগে হাতে ধান রোপণ করতে অনেক সময় ও শ্রমিক লাগত। এখন রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে অল্প সময়ে চারা রোপণ সম্ভব হওয়ায় শ্রমিক খরচ কমেছে এবং ভালো ফলনের আশা করছি।

স্থানীয় কৃষি উদ্যোক্তা বোরহান উদ্দিন বলেন, এলএসটিডি প্রকল্পের উদ্যোগে আধুনিক যন্ত্রপাতি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এতে কৃষি খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং ধান চাষ আরও লাভজনক হবে।

উল্লেখ্য, এলএসটিডি প্রকল্পের আওতায় চারিয়া প্রযুক্তি গ্রামে কৃষি যন্ত্রপাতির প্রায়োগিক পরীক্ষণের পাশাপাশি আধুনিক ধানের জাত জনপ্রিয়করণ, ধানের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এলাকার উপযোগী জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ধারাবাহিকভাবে কাজ করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা।

কালের কণ্ঠ
৪
ঢাকা। মঙ্গলবার। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
১৩ মাঘ ১৪৩২। ৭ শাবান ১৪৪৭

প্রত্যাশার পথরেখা

৪

জলবায়ু

ছবি : শেখ হাসান

কালের কণ্ঠ

অভিযোজনের উপায় সমাজব্যবস্থাতেই বিদ্যমান

ড. মোহাম্মাদ কামরুজ্জামান মিলন

কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষি জলবায়ু বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশের জলবায়ু সংকট আর ভবিষ্যতের কোনো দূরবর্তী আশঙ্কা নয়; এটি এখনকার বাস্তবতা। ২০২৪ সালের অভিজ্ঞতা যদি আমাদের চোখ খুলে দিয়ে থাকে, তাহলে ২০২৫ সাল সেই বাস্তবতা আরো কঠিনভাবে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। বছরের শুরুতেই অস্বাভাবিক উষ্ণতা, এরপর সময়ের আগেই বর্ষার আগমন, আবার বর্ষা শেষে স্বাভাবিক বিরতির বদলে দীর্ঘস্থায়ী অতিবৃষ্টি—সব মিলিয়ে জলবায়ুর যে সময়সূচির ওপর ভর করে দেশের কৃষি, খাদ্য ও জীবিকা ব্যবস্থা এত দিন চলছিল, তা এখন আর নির্ভরযোগ্য নয়।

২০২৫ সালের শুরুতেই এর প্রভাব দেখা যায় মাঠে। আগাম বর্ষার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো ধান কাটা ব্যাহত হয়। অনেক জায়গায় ধান মাঠেই ভিজে যায়, কোথাও যান্ত্রিক উপায়ে ফসল কাটাই সম্ভব হয়নি। আবার বর্ষা শেষে যখন আমন ধান পাকার কথা, তখন অতিবৃষ্টির কারণে জমিতে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। শাক-সবজি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর রবি মৌসুমের জন্য জমি প্রস্তুতি সময়মতো করা যায় না। আগাম বর্ষা ও বর্ষা-পরবর্তী অতিবৃষ্টির এই দ্বিমুখী চাপ কৃষিকে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি অনিশ্চিত করে তুলেছে।

এমন এক সময়ে কালের কণ্ঠ ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পা রেখেছে, যখন দেশ একটি নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনার দ্বারপ্রান্তে। তাই প্রশ্নটি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে—নতুন সরকার জলবায়ু পরিবর্তনকে কিভাবে দেখবে? ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে, নাকি এখনই সিদ্ধান্ত ও বিনিয়োগ প্রয়োজন এমন একটি চলমান জাতীয় সংকট হিসেবে?

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অনেক কার্যকর উপায় আমাদের সমাজ, কৃষি ও পানিব্যবস্থার মধ্যেই ঐতিহাসিকভাবে বিদ্যমান। সমস্যা হলো, আমরা সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নীতির সঙ্গে যুক্ত করতে পারিনি।

বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে একটি মৌসুমি জলবায়ুর দেশ। নিয়মিত বর্ষা, নদীর স্বাভাবিক প্লাবন আর পলিমাটির উর্বরতার ওপর ভর করেই গড়ে উঠেছে আমাদের কৃষিব্যবস্থা। আউশ, আমন ও রবি—এই তিন মৌসুম ভিত্তিক চাষাবাদ ছিল প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটি স্বাভাবিক কাঠামো। নদী, খাল, বিল ও ঝিল অতিরিক্ত পানি ধরে রেখে বন্যার ক্ষতি কমাত, আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির জোগান দিত।

কিছু গত কয়েক দশকে এই ভারসাম্য ধীরে ধীরে ভেঙে পড়েছে। এখন বর্ষা শুধু বেশি বৃষ্টির নাম নয়—এটি আগেভাগে আসে, মাঝখানে দীর্ঘ বিরতি দেয়, আবার বর্ষা শেষ হওয়ার পরও থামে না। ২০২৫ সালের অভিজ্ঞতা সেই পরিবর্তনের স্পষ্ট উদাহরণ। আগাম বর্ষায় বোরো ও সবজি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আবার বর্ষা-পরবর্তী অতিবৃষ্টিতে আমন ধান ও রবি মৌসুমের প্রস্তুতি ব্যাহত হয়েছে। অর্থাৎ সমস্যা শুধু বৃষ্টির পরিমাণ নয়, সময়ের কেন্দ্রবিন্দু হলো সময়।

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে গড় তাপমাত্রা বাড়ছে এবং রাতের তাপমাত্রা দিনের তুলনায় দ্রুত বাড়ছে, যা ধানসহ প্রধান ফসলের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর। একই সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বাড়ছে। আগাম বর্ষা ও বর্ষা-পরবর্তী অতিবৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে এই লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা উপকূলীয় কৃষিকে দ্বিগুণ ঝুঁকির মুখে ফেলছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা—অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জলাভূমি ভরাট, নদী ও খালের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা এবং ভূগর্ভস্থ পানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা।

এই বাস্তবতায় সবচেয়ে বড় চাপ এসে পড়ছে কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার ওপর। ২০২৫ সাল দেখিয়ে দিয়েছে, কৃষকের প্রচলিত ফসল ক্যালেন্ডার আর আগের মতো কাজ করছে না। কোথাও আগাম বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হচ্ছে, আবার কোথাও বর্ষা-পরবর্তী অতিবৃষ্টির কারণে জমি সময়মতো শুকাচ্ছে না। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে উৎপাদন খরচ, বাজারদর, কৃষকের আয় এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ওপর। খাদ্য নিরাপত্তা এখন আর শুধু উৎপাদনের প্রশ্ন নয়; এটি সময়, ঝুঁকি ও ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন।

তবু এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও আশার জায়গা আছে। সাম্প্রতিক গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, কিছু নির্দিষ্ট কৃষি উদ্ভাবন এই নতুন জলবায়ু বাস্তবতায় কার্যকর হতে পারে। বিকল্প সেচ পদ্ধতি (এডব্লিউডি প্রযুক্তি) ধানক্ষেতে পানি ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি অনিয়মিত বৃষ্টির মধ্যেও সেচ ব্যবস্থাপনায় নমনীয়তা এনেছে। একইভাবে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত প্রিন্ড ইউরিয়া অ্যাগ্রিকেটর সার ব্যবহারের দক্ষতা বাড়িয়ে ফলন ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। অতিবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টির সময় সারের অপচয় কমিয়েছে। এসব উদাহরণ দেখায়, সঠিক উদ্ভাবন ও নীতিগত সহায়তা থাকলে জলবায়ু ঝুঁকির মধ্যেও কৃষি টিকে থাকতে পারে।

এখানেই আসে অতীত থেকে সমাধান খোঁজার বিষয়টি। নদী ও খাল পুনরুদ্ধার এবং জলাভূমি সংরক্ষণ আগাম বর্ষা ও বর্ষা-পরবর্তী অতিবৃষ্টির পানি ধারণে কার্যকর হতে পারে। ফসলবৈচিত্র্য কৃষকদের মৌসুমি ঝুঁকি কমাতে পারে। ভাসমান ও উঁচু বেড কৃষি জলাবদ্ধ এলাকায় খাদ্য উৎপাদনের বিকল্প পথ দেখাতে পারে। আর স্থানীয় বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনিশ্চিত মৌসুমে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ তৈরি করে।

নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা তাই খুব স্পষ্ট। জলবায়ু ঝুঁকি অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক কৃষি পরিকল্পনা নিতে হবে। পরিবর্তিত মৌসুমের সঙ্গে মিলিয়ে ফসল ক্যালেন্ডার নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। পানি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার করে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। তাপ ও জলাবদ্ধতা সহনশীল ফসলের জাত দ্রুত মাঠ পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে। দুর্যোগের পর প্রতিক্রিয়া নয়, বরং আগাম বর্ষা ও বর্ষা-পরবর্তী ঝুঁকি মাথায় রেখে আগেই প্রস্তুতি নিতে হবে। কৃষি বীমা ও সামাজিক সুরক্ষাকে একসঙ্গে ভাবতে হবে। অভিযোজন অর্থায়নকে প্রকল্পভিত্তিক না রেখে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনার আওতায় আনতে হবে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিটি নীতির জন্য স্পষ্ট জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়; এটি উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায্যতার প্রশ্ন। ২০২৫ সাল আমাদের আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে, জলবায়ুর মৌসুম বদলে গেছে, কিন্তু নীতির গতি এখনো ধীর। অতীত আমাদের শিখিয়েছে, এই ভূখণ্ডে টিকে থাকার সবচেয়ে বড় শক্তি অভিযোজন। নতুন সরকারের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ হলো দুর্যোগের পর প্রতিক্রিয়া নয়, বরং আগাম প্রস্তুতি ও কার্যকর নীতির মাধ্যমে পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। যদি সেই অতীতের জানকে আধুনিক বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও কার্যকর বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে ভবিষ্যৎ শুধু টিকে থাকার নয়; নিরাপদ ও টেকসই উন্নয়নেরও হতে পারে। এই প্রত্যাশায়ই আজকের বাংলাদেশ। ■

সুপারিশ

- জলবায়ু ঝুঁকি অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক কৃষি পরিকল্পনা নিতে হবে
- পরিবর্তিত মৌসুমের সঙ্গে মিলিয়ে ফসল ক্যালেন্ডার নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে
- পানি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার করে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে
- তাপ ও জলাবদ্ধতা সহনশীল ফসলের জাত দ্রুত মাঠ পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে
- দুর্যোগের পর প্রতিক্রিয়া নয়, ঝুঁকি মাথায় রেখে আগেই প্রস্তুতি নিতে হবে
- কৃষি বীমা ও সামাজিক সুরক্ষাকে একসঙ্গে ভাবতে হবে
- প্রতিটি নীতির জন্য স্পষ্ট জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে